ভয়ঙ্করদের
দ্বীপ
অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম প্রকাশ

প্রযোজনা **খেলাধুলো**

পরিকল্পনা সুজিত কুন্ডু

রূপায়ন স্নেহময় বিশ্বাস

এ জাহাজ থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যমজ দ্বীপটাকে।

প্রফেসর নাট বল্টু চক্র চোখ কুঁচকে চেয়েছিলেন পাহাড় দুটোর দিকে। চোখের নিবিড় চাহনি দেখে কে বলবে, সুদূর কলকাতা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপে আসতে গিয়ে তাঁর জিভ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পথকষ্ট তো কম নয়। তাঁর বয়সটাও বাড়ছে।

কিন্তু কোন কথাই উনি শোনেন নি।

সেই যে জিওকেমিস্ট ভদ্রলোক এলেন ও'র কাছে, কানে কানে এমন মন্ত্র দিলেন যে, প্রফেসর ক্ষেপে গেলেন এখানে আসার জন্যে।

জিওকেমিস্ট ভদ্রলোক রয়েছেন প্রফেসরের পাশেই। পাগল—পাগল চেহারা। নাকের ফুটো দুটো বড়। বড় বড় লোম ঝুলছে ফুটো থেকে। মাথার চুল এত কম আর এত লালচে যে নেই বললেই চলে। কপাল খুব ছোট নাকটাও থ্যাবড়া। মুখের তলার দিকটা অবিকল এপম্যানদের নকলে বিধাতা গড়ে দিয়েছেন। চোখের নিচে ভাঁজ-ভাঁজ চামড়া আর পাটকিলে চোখের তারা দেখলে এমন লোককে মানুষ বলে মনে হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে তার গালের আর চিবুকের রোঁয়া-রোঁয়া দাড়ি তো নরবানরদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি, লোকটার গোঁফও নেই। খানকয়েক লালচে রোঁয়াকে নিশ্চয় গোঁফ বলা চলে না।

লোকটার নাম গোনজালা। কোন দেশের লোক, তা জানি না হাইট দেখেও আন্দাজ করা যায় না। বেঁটে মরকুটে নয়—আবার তালঢ্যাঙাও নয়। হাতদুটো অবশ্য বড্ড লম্বা। সবসময়ে দস্তানা পরে থাকে।

পাজামার মত ঢিলে প্যাণ্ট, ঢলঢলে শার্ট আর এহেন চেহারা—দেখলে হাসি পায় না?

গোনজালা ভাঙাভাঙা ইংরেজী বলে চলেছে। আমি তার গোটা গোটা বাংলা করে দিচ্ছি।

"প্রফেসার, এই সেই দ্বীপ।"

প্রফেসর মুগ্ধ চোখে পাহাড় জঙ্গল আর সমুদ্র দেখতে দেখতে বললেন—গোনজালা, এমন দ্বীপের সন্ধান পেলে কি করে?

গোনজালা হাসতে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ফেলল। ছ্যাতলা পড়া হলদে দাঁত। জন্মে দাঁত মাজে না।

বললে—আমি যে জিওকেমিস্ট। খনিজের সন্ধান করে বেড়াই।

"প্লাটিনাম মেট্যালদের দেখেছো এখানেই?

"ইয়েস, প্রফেসর। চাইটাও দেখিয়েছি আপনাকে।"

"সেটা দেখেই তো আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়েছে, গোনজালা।"

"আপনিই তো বললেন ওর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো মেট্যাল।"

"হ্যাঁ। অনেকগুলো। সবগুলোই প্লাটিনাম মেট্যাল। সবগুলোই দুষ্প্রাপ্য। কোনোটাকেই একজায়গায় তালতাল আকারে আজও পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় নি—

"কিন্তু এখানে তা আছে—বললে গোনজালা।

"প্লাটিনাম, রেডিয়াম, অসমিয়াম, ইরিডিয়াম, রুথেনিয়াম। আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য!"

"কিছুই আশ্চর্য নয়, প্রফেসর। পৃথিবীর সবটাই দেখা হয়ে গেছে, এমন কথা যে বলে, সে মানুষই নয়।"

চোখ ফিরিয়ে বললেন প্রফেসর—কথাটা এমনভাবে বললে, গোনজালা যেন তুমি একাই মানুষ—আর সবাই অমানুষ।"

লালটকটকে মোটকা জিভিখানা অর্ধেক বের করে গোনজালা বলে উঠল—কি যে বলেন। আমি আবার একটা মানুষ! আমি শুধু গোনজালা—জিওকেমিস্ট – এই পৃথিবীটা আমার বাড়ি—"

"যাকগে, দ্বীপে তুমি নেমেছিলে বলেছো। কোন পাহাড়টার মধ্যে আছে তাল তাল প্লাটিনাম ধাতু?"

"বাঁদিকেরটায়। এটাই একেবারে মরে গেছে। ডান দিকেরটায় এখনো একটু আঁচ আছে।"

এই পর্যন্ত শুনেই ফস্ করে আমি বলেছিলাম—আঁচ আছে? পাহাড়ে আবার আঁচ থাকে নাকি? পাহাড় কি উনুন?"

গোনজালা পাটকিলে চোখে পিট পিট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—"থাকে, থাকে, এরা যে এক কালে আগ্নেয়গিরি ছিল। এখনও একটার মধ্যে কাদা ফুটে যাচ্ছে—গেলেই দেখতে পাবে।"

"তার আগে, বললেন প্রফেসর—হেলিকপ্টারে করে—গোটা দ্বীপটাকে ওপর থেকে দেখে নেওয়া যাক।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলে উঠল গোনজালা—ওপর থেকে দেখলে কি-ই বা আর বুঝবেন—তবুও দেখা দরকার।"

অত্যাধুনিক এই জাহাজে সব ব্যবস্থাই ছিল। তক্ষুনি আমরা উঠে বসলাম ডেকের ওপর, খাড়া হেলিকপ্টারে বিকট আওয়াজ করে কপ্টার উঠলো শূন্যে।

তখন গোধূলি। একটু পরেই অন্ধকার আরও গাঢ় হবে। দ্বীপ দুটোকে দূর থেকে যতটা ক্ষুদে মনে হয়েছিল, ওপরে গিয়ে ততটা মনে হল না। এক-একটা দ্বীপ লম্বায় পাঁচ মাইল, আর চওড়াও মাইল তিনেক। দুই দ্বীপের মাঝে একটা সরু নালা—সেখানে সবুজ আগাছার ওপর সাদা কুয়াশার চাদর। জাহাজ নোঙর ফেলেছে পূবদিকে। দূরবীন কষেও ওদিকে কুয়াশা দেখিনি। দেখলাম পশ্চিম দিকে। আকাশ পথ থেকে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে কুয়াশা ঘন হয়ে লেপটে রয়েছে গাছপালার ওপর। কোথাও কিছু নড়ছে না।

কেন জানি না, গা-টা শির-শির করে উঠেছিল চারদিকের এই নিঝুমতা দেখে। কোথাও পাখি উড়ছে না। গাছপালা নড়ছে না—

হ্যাঁ, নড়ছে···নড়ছে...কুয়াশার ওই চাদর দুলে দুলে উঠছে.... চিকমিক করছে শেষ আলোয়।

পাহাড় দুটোর তলার দিকের রঙ হাল্কা সবুজ—ওপর দিকে ঘন সবুজ। তারপরেই আবার সেই সাদা কুয়াশা। সাদা চাদরে মোড়া। তারও ওপরে পাহাড়ের চুড়ো।

মাথাকাটা চুড়ো। আগ্নেয়গিরিই বটে। জ্বালামুখ। এককালে এখান থেকে ভলকে ভলকে আগুন, ধোঁয়া আর লাভা বেরিয়েছে। দ্বীপের প্রাণ কি তখন থেকে মুছে গেছে?

জাহাজে ফিরে এসে এই প্রশ্নই করেছিলাম গোনজালাকে।

আমরা তখন খেতে বসেছিলাম। গোনজালা লোকটা সত্যিই একটা জীব। মাংস-টাংস কিস্‌সু খায় না। শুধু ফল। এরকম নিরামিষাশী মানুষ জন্মে দেখিনি।

গোনজালা বললে—"ডিনোনাট, (পাঠক পাঠিকা চমকে যেও না—দীননাথ নামটা গোনজালার গলায় ওই রকম শোনায়), অ্যাটম বোমাটা ফাটানোর পর থেকেই নাকি এ দ্বীপের সবাই মরে গেছে।"

দুটো দ্বীপেরই?"

"তাই তো শুনেছি, কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললে গোনজালা—" সেই যে বোমাটা ফাটল ওই দূরে... আকাশ যেখানে জলে মিশেছে—"

কুট করে ফুটকুনি কাটলেন প্রফেসর—"এমন ভাবে বলছো গোনজালা যেন বোমা ফাটার সময়ে তুমি দ্বীপে ছিলে—"

চমকে ওঠে গোনজালা—"আমি? আমি কেন থাকতে যাবো? আমি যে জিওকেমিস্ট ইল্লিদিল্লি ঘুরতে হয়··· তখন তো শুনলাম অ্যাটম বোমা ফাটানো হয়েছিল এই দ্বীপেরই ধারে কাছে। কেননা মানুষ তো ছিল না এখানে।"

পোর্টহোল দিয়ে অন্ধকারে ঢাকা যমজ দ্বীপের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বললেন প্রফেসর—"সেটাও একটা ব্যাপার। দ্বীপের মানুষগুলো সব গেল কোথায়?"

"ম-মানে?"

"প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ তো—যতই একটেরে হোক না কেন, জংলী মানুষ থাকবেই। এখানে কেন নেই?"

"খাবারের অভাবে বোধ হয়; বললে গোনজালা। "তা হতে পারে" বলে চুপ মেরে গেলেন প্রফেসর।

পরের দিন সকালে হেলিকপ্টারে চেপেই পৌঁছোলাম দ্বীপের সৈকতে।

"কপ্টার চালক রিচার্ড কম'কথার মানুষ। সাদা-বালি ছাওয়া বালুকাবেলায় 'কপ্টার নামিয়ে এককথায় বলে দিলে —"আপনারা যান।"

"তুমি?" প্রফেসরের প্রশ্ন।

"এখানেই রইলাম।"

লোকটা এমনিতেই কাঠগোঁয়ার। ক্যাটকেটে কথা শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। প্রফেসর আমাদের লীডার তাঁকেও পরোয়া করে না।

ক্ষেপে গেলে বৃদ্ধকে সামলানো মুস্কিল। তাই খাঁটি বাংলায় বললাম—"ব্যাটা ভয় পেয়েছে।"

"ভয়? কাকে?" প্রফেসর চিড়বিড়িয়ে উঠলেন আমার ওপরেই।

"কাকে তা বলতে পারবো না। তবে আমারও গা ছম-ছম করছে কাল থেকেই।"

"ভীতুর ডিম কোথাকার!" বলেই হন্‌হন্ করে বালি মাড়িয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে রওনা হলেন প্রফেসর।

"গোনজালা 'কপ্টার' থেকে নেমেই হেলে দুলে ছুটেছিল বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোর দিকে। লোকটার পায়ে সিরি-য়াস ডিফেক্ট আছে নিশ্চয়। ওই জন্যে অমন পাৎলুন পরে —পাজামা ছাড়া যাকে আর কিছুই বলা যায় না। পায়ের বুটজুতো জোড়া যে মুচি বানিয়েছে, বলিহারি যাই তার কল্পনার।

বুটের মাথা এত চ্যাপ্টা কখনো হয়? সার্কাসের ক্লাউ-নেরাও এহেন বদখৎ বুট পরে না।

গেল কোথায় পাগলা জিওকেমিস্ট?

প্রফেসর হন্‌হন্ করে কিছুটা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। ইতি-উতি তাকাচ্ছিলেন গোনজালাকে দেখবার জন্যে।

"পেছনে গিয়ে আমি বললাম—" ওই তো পাথরগুলোর আড়ালে ঢুকে গেল।"

প্রফেসর কোমরের বেল্ট ধরে প্যাণ্টটাকে টেনে তুলতে তুলতে খেঁকিয়ে উঠলেন—" আপদ! নতুন জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে তো।"

বেল্ট পরা প্রফেসরের ধাতে সয় না। ট্রাউজার্স পরেন না বেল্ট পরতে হবে বলে। কোমর বন্ধনী নাকি তাঁর দমবন্ধ করে দেয়। কিন্তু দ্বীপের পাহাড় জঙ্গলে ধুতি পাঞ্জাবী পরে অভিযানে যাওয়া যায় না। তাই আমি কলকাতা থেকেই ওঁর জন্যে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু চামড়ার বুট আর মোটা জিন্‌সের প্যাণ্ট এনেছি। নিজেও তা পরেছি। পোকামাকড় থাকতে পারে, সাপ বিছে থাকতে পারে—একটা কামড় খেলে প্রাণটাও সটকান দিতে পারে।

এখন সকাল সাতটা। রোদ বেশ মিঠে। নীল আকাশ

বড় ভাল লাগছে। তার চাইতেও ভাল লাগছে নীল সমুদ্রকে। পুরীর বঙ্গোপসাগর আর বম্বের আরবসাগর দেখে যারা দু-হাত তুলে নাচে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না প্রশান্ত মহাসাগরের এই রূপকে। চারদিক থেকে ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে ঢেউগুলো একের পর এক আছড়ে পড়ছে দ্বীপদুটোর ওপর। অটল মহিমায় এদের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সবুজ আর সাদায় অপরূপ দু-দুটো পাহাড়।

রোদ ঠিকরে যাচ্ছে এদের গা থেকে। জঙ্গলকে কেন যে সবুজ সোনা বলা হয় তা এইদ্বীপযুগলের সৈকতে দাঁড়িয়ে মুগ্ধাবেশে অনুভব করলাম। বেলাভূমির বালি কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে, তার পর পাথরের চাঁই আর চাঁই। তেড়াবেঁকা, গোলগাল, এবড়োখেবড়ো। ডাইনে বাঁয়ে যতদূর চোখ গেল, এই ধরনের পাথর পড়ে আছে সৈকতকে পাহারা দিয়ে।

ঠিক যেন পাঁচিল। প্রকৃতি নিজের হাতে বড় বড় পাথর ফেলে দ্বীপদুটোকে ঘিরে রেখে দিয়েছেন যাতে নোনাজল ভেতরে ঢুকতে না পারে। নোনা জলের আতঙ্করা সবুজ সোনার লোভে দ্বীপের শান্তি নষ্ট করতে না পারে।

আমি চিরকালই একটু উল্টো দিক থেকে ভাবিতো। তাই আমার মনে হল, পাথর ফেলা আছে বলেই দ্বীপের আতঙ্করা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না—অন্তহীন রহস্য নিয়ে আটকে রয়েছে দ্বীপের মধ্যে।

আতঙ্ক? রহস্য? যত্তোসব উল্টোপাল্টা চিন্তা। মনে মনে নিজেই নিজেকে ধমক দিয়ে তাকালাম গোনজালার সন্ধানে।

উড়ে গেল নাকি লোকটা?

যে কথাটা গতকাল থেকেই ঘুরঘুর করছিল মাথার মধ্যে এবার তা সুরুৎ করে চলে এল জিভের ডগায়। বলেই ফেললাম প্রফেসারকে—"গোনজালা বলছিল দ্বীপের কাছেই অ্যাটম বোমা ফাটানো হয়েছিল। কত বছর আগে?"

বোমা যখন ফাটে তখন হাওয়া বইছিল অন্যদিকে......

"বিশ বছর আগে।"

"পারমাণবিক ধুলো আর বিকিরণ তো দ্বীপেও পৌঁছেছে—চারদিক খাঁ-খাঁ করছে ওই জন্যেই। কেউ বেঁচে নেই।"

"দীননাথ, উজবুক বলেই প্রশ্নটা এখন করছো। আমি আগেই করেছিলাম। গোনজালা সব খবরই রেখেছে। তিনমাস অন্তর তিনবার বৈজ্ঞানিকরা এ দ্বীপে এসে দেখে গেছেন, পারমাণবিক বিষ রেহাই দিয়ে গেছে দুটো দ্বীপকেই।"

"কেন?"

"বোমা যখন ফাটে, তখন হাওয়া বইছিল অন্যদিকে। ধুলো এদিকে আসে নি। রেডিয়েশন যেটুকু এসেছে, তা ডেঞ্জার লেভেলের অনেক নিচে।"

"ও", বলে ঢোক গিললাম আমি—"মানুষজন কোন-কালেই কি দ্বীপে ছিল না?"

"না। টেস্ট হয়েছিল সেই কারণেই। লোক থাকলে সরিয়ে দেওয়া হত।—কিন্তু গোনজালা গেল কোথায়? গোনজালা! গোনজালা!…গোনজালা!"

আচমকা এ রকম বিকটভাবে যে উনি চেঁচিয়ে উঠবেন, ভাবতে পারিনি। তেড়াবেঁকা পাথর গুলোর ওপর দিয়ে বিচ্ছিরি চিৎকারটা সাঁৎ করে ছুটে গিয়ে যেন দমাস করে আছড়ে পড়ল সবুজ সোনাদের ওপর। তারপর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি জাগিয়ে সেই ডাকই ফিরে এল কানে—"গেনেজালা! গোনজালা! গোনজালা!"

জঙ্গলের মধ্যে গোটা তিন চার পাখি কেবল উড়ে গেল সেই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির আছাড়ি পিছাড়িতে তার বেশি নয়।

খটকা লাগল আমার তখনি। এত গভীর জঙ্গল—অথচ এত কম পাখি!

শ্মশান দ্বীপ নাকি? প্রাণের চিহ্ন যাও বা দেখলাম এত কম?

আচমকা পিলে চমকে গেল আমার রক্ত জল করা একটা শব্দে।

জঙ্গলের অনেক ভেতর থেকে, পাহাড়ের ডানদিক থেকে ভেসে এল অনেকগুলো গলায় অমানুষিক আকাশ ফাটা চিৎকার,—"আঁহু! আঁহু!…আঁহু!"

সেই চিৎকারের রেশ মিলোতে না মিলোতেই আবার পাহাড়ের বাঁদিক থেকে জঙ্গলের মাথায় নাচতে নাচতে ছুটে এল রক্ত জল করা ভয়াবহ সেই হাহাকার—"আঁহু-উ!… আঁহু—উ! আঁহু—উ!"

আর তারপরেই পাহাড় দুটির একদম ওদিক থেকে আবার সেই হৃৎপিণ্ড-স্তব্ধ-করা নারকীয় আর্তনাদ—আঁহু!… আঁহুঃ! আঁহু—!"

তারপরেই সব চুপচাপ। জঙ্গল স্তব্ধ। পাখিরা কেউ নেই। কানে ভেসে আসছে কেবল বিরামবিহীন ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ!

গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছিল অমানুষিক শব্দ পরম্পরা শুনে। পরিষ্কার দিনের আলোয় নীল আকাশের নীচে একী কাণ্ড! কারা ওভাবে চেঁচাচ্ছে? কেন চেঁচাচ্ছে?

প্রফেসর ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আমার দিকে। তাঁর চোখ দুটো শুধু কুঁচকে গেছে দেখলাম। ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। খুব কূট একটা চিন্তা নিয়ে ভেবেই চলেছেন তন্ময় হয়ে।

গলা শুকিয়ে গেছিল। ওঁর পেছনেই বেশ কিছু দূরে বড় বড় বিশাল পাথরগুলোর দিকে চাইতেই নামহীন আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল আমার।

দস্তানা পরা একটা হাত আগে দেখা গেল একটা বিশাল পাথরের মাথায়। তার পাশে উঠে এল আর একটা হাত। সাদা দস্তানা। আমি চিনি। গোনজালার।

আর তার ঠিক পরেই একটা মাথা ঠেলে উঠল দুই দস্তানার মাঝ দিয়ে। মাথায় লালচে চুল খুব অল্প।

সট্ করে উঠে এল পুরো মুণ্ডটা।

গোনজালা তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

এবং, দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। হলুদ দাঁতগুলো এতদূর থেকেও গা ঘিনঘিনিয়ে দিচ্ছে আমার। মুখবিবর ঘিরে লালচে রোঁয়ার মত গোঁফ দাড়ি আর নাকের ফুটো থেকে ঝুলে পড়া লালচে চুলগুলোও এত কদর্য লাগছে যে বলবার নয়।

পার্টকিলে চোখে পিট পিট করে চেয়ে রইল গোনজালা।

প্রফেসর তার দিকে পেছন ফিরে থাকায় কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু আমার চোখমুখ দেখে ছিলেন। নিশ্চয় নিঃসীম আতঙ্কে তা বিকৃত বীভৎস হয়ে গেছিল।

তাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে অপরিসীম উদ্বেগে প্রশ্ন করেছিলেন—"কি হয়েছে? কী হয়েছে, দীননাথ?

আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। জবাব দোব কী? হাত তুলে শুধু দেখিয়েছিলাম তাঁর পেছন দিকে—যেখানে তখনও মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে গোনজালা বিকট হাসি হেসে চলেছে।

সবেগে পেছনে ফিরে ছিলেন প্রফেসর। আর সঙ্গে সঙ্গে সাঁৎ করে কদাকার মুখটা নেমে গেল। পাথরের আড়ালে, নেমে গেল সাদা দস্তানা দুটোও।

স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। তাঁর পেছনে থাকায় মুখের চেহারাটা দেখতে পেলাম না—তবে শরীরটা যে হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে, তা বুঝলাম।

সমুদ্রের অশান্ত গজরানি ছাড়া আশেপাশে দূরে কোথাও

আর কোন শব্দ নেই। পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়েও মনে হচ্ছে যেন এক অপার্থিব জগতে এসে পড়েছি।

আচমকা উল্লসিত গলায় শুনলাম একটা ডাক ;

"ডিনোনাট!"

আমার কানে যেন ডিনা মাইট ফাটল ডাকটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। আঁৎকে উঠে সভয়ে প্রফেসরকে হ্যাঁচকা টান মেরে বলেছিলাম—"পালিয়ে আসুন! পালিয়ে আসুন!"

শক্ত হয়ে প্রফেসর দাঁড়িয়েই রইলেন। চেয়ে আছেন সেদিকে, যে জায়গাটায় একটু আগে বিচ্ছিরি মুণ্ড সেখানে দেখেছি, তার একটু পাশেই।

দুটো বড় পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে গোনজালা। মাতাল হাওয়ায় লটপট করছে তার পাৎলুন, নিশানের মত গা থেকে উড়ে যেতে চাইছে ঢলঢলে শার্ট।

"ডিনোনাট!"

প্রফেসর এমনিতে নরম ধাতের মানুষ। কিন্তু রেগে গেলে যাচ্ছেতাই রকমের কর্কশ হয়ে যান।

এখন যে হয়েছেন, তা তাঁর কাঠচেরা গলাবাজি শুনেই মালুম হয়ে গেল—"বলি, ব্যাপারটা কী?"

দুলে দুলে পাথরের ফাঁক ছেড়ে এগিয়ে এল গোনজালা। বললে—"হে! হে! হে! ডিনোনাটকে ভয় দেখাচ্ছিলুম।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে? এটা ইয়ার্কি মারার জায়গা?"

"একটু-আধটু রগড় না করলে যে আমরা পারি না!"

"আমরা! মানে?"

বিটকেল হলুদ দাঁত বের করে আর এক দফা হেসে নিল গোনজালা—"আপনাকে মস্ত খবরটা দিইনি চমকে দেব বলে।"

"কী খবর?" গোনজালা তখন আরও এগিয়ে এসেছে। একটা উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে নাকে।

"বললে কি বিশ্বাস করবেন? দুলে দুলে আরও সামনে এসে দাঁড়ালো গোনজালা। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম সারা মুখে তেল মেখেছে। মুখ চকচক করছে সকালের রোদে—উগ্র গন্ধটাও আরও ঝাপটা মারছে আমার নাসিকারন্ধ্রে।

"করব," চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছেন। প্রফেসর।

"কারা এখুনি চেঁচালো বলুন তো?"

"সে প্রশ্নটা আমিই করতে যাচ্ছিলাম।"

"প্রফেসর, আপনি জানতে চাইছিলেন, এ দ্বীপে মানুষ মানুষ নেই কেন—মনে আছে?"

"আছে।"

"মানুষের মতই আর একরকম প্রাণী এ দ্বীপটা দখল করে আছে বলে।"

"মানুষের মত প্রাণী!"

"ডি-এন-এ মিলিয়ে দেখা গেছে, এরাই মানুষের সব চাইতে কাছের না-মানুষ আত্মীয়।"

"শিম্পাঞ্জীদের কথা বলা হচ্ছে?"

'ইয়েস স্যার। অনেক....অনেক বছর আগে আফ্রিকার তানজানিয়া থেকে একদল শিম্পাঞ্জী এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই জঙ্গলে। তারাই এখন এ দ্বীপের অধীশ্বর। মানুষকে তারা অনেক অনেক বছর আগেই খেদিয়ে দিয়েছে পাহাড় আর জঙ্গল থেকে।"

"তোমার সঙ্গে এত ভাব কেন?"

"কারণ আমি যে ওদের ভাষা শিখেছি—আমাকে দেখতে যে ওদের মতই।"

হা হয়ে শুনছিলাম গোনজালার কথা। গোড়া থেকেই লোকটাকে নরবানরের মত দেখতে মনে হয়েছে। গরিলার মত নয়, ওরাংওটাং-এর মতও নয়—সার্কাসের শিম্পাঞ্জীর মত। 'প্রোজেক্ট এক্স' ফিল্মে এদের দেখেছি। আমি জানি এদের স্বাভাবিক সঙ-এর মত দেখতে হলেও এরা যুদ্ধ করতে পোক্ত, খুনে স্বভাবটা এদের রক্তে। ক্রম বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে 'হোমো স্যাপিয়েন্স' অর্থাৎ মানুষ জাতটার কাছাকাছি এসেও হড়কে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জী! যমজ দ্বীপে তাহলে শিম্পাঞ্জীদের রাজত্ব চলছে?

চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন প্রফেসর—"শিম্পাঞ্জীরা তাহলে ঠেঙিয়ে মানুষদের বিদেয় করেছে?"

"কোন কালে?"

"কিন্তু তোমাকে কোলে টেনে নিয়েছে।"

"কারণটা আগেই বলেছি। দেখতে আমাকে অবিকল শিম্পাঞ্জীদের মতই।"

"তাতো দেখতেই পাচ্ছি। স্বভাবের ফিচলেমিও রয়েছে," প্রফেসরের কথায় এখন ছুরি চলছে—"তা নকল শিম্পাঞ্জী মশায়, মুখে এই তেলটা কেন মেখে এলে?"

"আর বলেন কেন! অনেকদিন পরে আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে মুখে ফলের রস মাখিয়ে দিল।"

"ফল-টলও খেয়ে এলে?"

"তাতো খেতেই হবে।"

"আহারেও যে শিম্পাঞ্জীদের মত। যাক, এখন কি মতলব?"

মতলব? পাটকিলে চোখে বিস্ময় নিচেয়ে বললে গোনজালা—এত কাঠ খড় পুড়িয়ে এলেন যা করতে, সেটা করে আসি চলুন।...

ও হ্যাঁ, প্লাটিনাম মেট্যালদের ডিপোজিট। আজ থাক।"

"কেন, প্রফেসর, কেন?

বাজখাঁই চিৎকার শোনা গেল পেছন থেকে। রিচার্ড এতক্ষণ সব দেখেছে, শুনেছে—কিন্তু একটাও কথা বলেনি। এবার চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে—"না! না! না!

"কেনরে? কেন না?" বলেই হেলে দুলে হেলিকপ্টারের দিকে তেড়ে গেল গোনজালা।

আমি আর প্রফেসর দুজনেই ওকে ধরতে গিয়ে ধরতে পারলাম না। সাঁৎ করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আমাদের হাত গলে ছুটে গেল গোনজালা এবং অদ্ভুত লাফ মেরে উঠে গেল রিচার্ডের পাশে।

শুনতে পেলাম তার চিৎকার—"কেন? যাবি না কেন? তোকেও যেতে হবে।"

"দূর হ! বাঁদর কোথাকার! ওঃ ওঃ ওঃ!"

রক্তজল করা চিৎকারটা ঠিকরে এল রিচার্ডের গলা থেকেই। দূর থেকেই দেখতে পেলাম তিড়বিড়িয়ে লাফ দিয়ে নেমে এল সে বালির ওপর। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে গড়িয়ে গেল কিছুটা। তারপর স্থির। নিস্পন্দ।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নি। পালকের মত হাল্কা লাগছিল নিজেকে। কেউ বিপদে পড়লে এমনিই হয় আমার। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দৌড়োই তাকে বাঁচাতে।

প্রফেসর আমাকে ধরতে গেছিলেন। কিন্তু বুড়ো শরীর আমার সঙ্গে পারবেন কেন? পেছন থেকে কেবল চেঁচিয়েই গেলেন—"সাবধান! সাবধান! সাবধান!"

কাকে সাবধান? কিসের সাবধান? জলজ্যান্ত একটা লোক ছটফটিয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেল, তাই দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নেমে ততক্ষণে তফাতে সরে গেছে গোনজালা। চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্যে দেখলাম, হাতে রয়েছে একটা থলে।

মনে মনে ককিয়ে উঠে ঝাঁকুনি দিতে গিয়েছিলাম ওর দেহটা ধরে......

নক্ষত্রবেগে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলাম রিচার্ডের ওপর।

বেচারী রিচার্ড! বেচারী রিচার্ড। একী মুখের চেহারা তোমার?

মনে মনে ককিয়ে উঠে ঝাঁকুনী দিতে গিয়েছিলাম ওর দেহটা ধরে। জানি সে দেহ থেকে প্রাণ উড়ে গেছে একটু আগেই আমাদের চোখের সামনেই—তবুও...তবুও···

পেছন থেকে প্রফেসর জাপটে ধরলেন আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলেন আকুল গলায়—বোকা! বোকা! বোকা! তফাৎ যাও! তফাৎ যাও!"

বিহ্বল চোখে তাকিয়েছিলাম প্রফেসরের পানে। শুধিয়েছিলাম ব্যাকুল গলায়—প্রফেসর! প্রফেসর! কিভাবে মারা গেল রিচার্ড?

"সেটা দেখতে দাও—হাঁদারাম গোয়ার—সরে দাঁড়াও।" বলে এক ঝটকায় আমাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে হেঁট হলেন প্রফেসর এবং রিচার্ডের দুটো ঠ্যাং ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনলেন কিছুটা। ঠ্যাং ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন রুদ্ধশ্বাসে—"দেখেছো?"

দেখলাম বটে। বালিতে মাখামাখি হয়ে গেলেও তাদের চেনা যাচ্ছে। কালো কুচকুচে তাদের দেহ। সারা গায়ে টকটকে লাল ফুটকি। ভেলভেটের গা বললেও চলে।

আটখানা পা কুঁকড়ে গুটিয়ে শক্ত হয়ে আছে।

সংখ্যায় তারা তিন। তিনজনে একই সাথে বিষ ঢেলে দিয়েছে বেচারী রিচার্ডের অঙ্গে। দেহের চাপে পিষ্ট হয়ে পটল তুলেছে তার পরেই। রিচার্ডের দেহের ওজন তো কম নয়। আর এরা আধ ইঞ্চির চেয়ে বড় নয়।

মাত্র আধ ইঞ্চি দেহের মাপ! কিন্তু কী বীভৎস আকৃতি!

না, এরা পোকা নয়। পোকাদের থাকে ছ'টা পা। এদের রয়েছে আটখানা পা। এরা যখন আট ইঞ্চি বড় শরীর নিয়ে জ্যান্ত পাখি ধরে খায় তখন তাদের টারানটুলা বলা হয়। কিন্তু মাত্র আধইঞ্চি মাপের মখমল কোমল বপু নিয়ে এরা কারা? কেন এত নৃশংস? হত্যালালসায় কেন এত উদগ্রীব?

হত্যা সংকল্পই জাগ্রত হয়েছিল আমার দুই চোখে। জ্বলন্ত চোখে চেয়েছিলাম দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গোনজালার দিকে।

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

বিরাট বিরাট পাথর গুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কাতারে কাতারে শিম্পাঞ্জী। দুলে দুলে চলছে ঠিক গোনজালার মতই। চেহারাও অবিকল গোনজালার মত। দেখতে দেখতে হেলিকপ্টার আর আমাদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল শিম্পাঞ্জী বাহিনী। মারমুখো আকৃতি আর নৃশংস পাটকিলে চাহনি দেখেই বুঝলাম, নড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

গোনজালা একা দাঁড়িয়ে একটু তফাতে।

অশান্ত সমুদ্র গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল তার উচ্চকণ্ঠ —"প্রফেসর! ডিনোনাট! এবার বুঝেছেন আমাদের শক্তিটা কোথায়?"

"ওই মাকড়শা?" আশ্চর্য শান্ত গলায় বললেন প্রফেসর।

"হ্যাঁ। যাদের মোট চল্লিশ হাজার রকমের প্রজাতিরা রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময়।"

"রাজত্ব আর করছে কোথায়! বেশ শান্ত ভাবেই ব্যঙ্গ করেন প্রফেসর "যাদের মেয়েরা ছেলেদের ধরে খেয়ে ফ্যালে, তারা কোনদিনই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারবে না।"

দপ্ করে জ্বলে উঠল গোনজালার পাটকিলে চোখ। হলদে দাঁত কিড়মিড় করে—"আপনাকে তাহলে গ্রীক পুরাণের সেই গল্পটা বলতে হয়।"

"মিনার্ভা আর অর্চনার সেই গল্পটা?" প্রফেসরের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর।

"অর্চনা?" সমান ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয় গোনজালার গলায়।

"আরে, ঐ হল গিয়ে। নাম তার Arachne—আমি নাম দিয়েছি অর্চনা। ক্ষতি কী? আমরা বাঙালীরা নাম-ধামগুলোকে একটু মিষ্টি করে নিই। তা গল্পটা শোনাও।"

"জানেন মনে হচ্ছে।"

জানাবো না কেন? কে ভাল বুনতে পারে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়েছিল অর্চনা নামে মেয়েটা আর দেবী মিনার্ভার মধ্যে। জিতে গেল অর্চনা। রেগেমেগে মিনার্ভা তার বোনা কাপড় ছিঁড়ে ফেললে। ভীষণ দুঃখ পেয়ে গলায় দড়ি দিতে গেল অর্চনা। অমনি মন গলে গেল মিনার্ভার। দড়িটাকে বানিয়ে দিলেন মাকড়শার জাল— আর অর্চনাকে মাকড়শা!"

"ঠিক! ঠিক! ঠিক!"

"বেঠিক কথা কবে বলেছি? অর্চনা নামটা থেকেই মাকড়শাদের নাম হয়ে গেল Arachnida—তাই না?"

"ঠিক! ঠিক! ঠিক!"

"এবার বলোতো ছোকরা—ছোকরা বলছি বলে রাগ কোরো না, গোনজালা—তোমার এই শিম্পাঞ্জী স্যাঙাৎদের লেলিয়ে দিও না—অর্চনাদের কামড় থেকে তোমরা কিভাবে টিঁকে আছো?

হলদে দাঁত বার করে গোনজালা বললে—"তেল দিয়ে।"

"অ্যাঁ! মাকড়শাদের তেল দিয়ে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

"সে তেল নয়,···সে তেল নয় সত্যিকারের তেল।

জাল পেতে মাছ ধরেছে মাকড়শারা। যে ভাবে পোকামাকড় ধরে ঘরের কোণে—সেইভাবে পাকা জেলের মত হাওয়ায় জাল উড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে মাছ ধরে আনছে নোনা জল থেকে !

গা শির শির করে উঠল তাই দেখে।

"এরা মাছ খায় ?" প্রশ্নটা অজান্তেই বেরিয়ে গেছিল মুখ দিয়ে।

জবাবটা দিলে গোনজালা পাশ থেকে—"ডিনোনাট, এই গাছের তলায় দ্যাখো।"

দেখলাম। শিউরে উঠলাম। একটা নরকঙ্কাল। না না। একটা নয়—অগুন্তি। মানুষের হাড়ের পাহাড় রয়েছে যেন গাছের তলা বরাবর—ডাইনে বাঁয়ে যতদূর দুচোখ যায়—কেবল হাড় আর হাড় !

গোনজালা বললে—

"ডিনোনাট ! প্রফেসর ! এই জন্যেই আপনাদের নিয়ে এসেছি।"

শাখামৃগর মত গাছের ডালে বসে বললেন প্রফেসর নাট বল্টু চক্র—"কী জন্যে ? এত মানুষের হাড় কেন ?"

"ওগুলোর সব মানুষের হাড় নয়, প্রফেসর। ওদের মধ্যে আছে শিম্পাঞ্জীদেরও হাড়।"

"কেন ? কেন ?"

"মাকড়শাদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। যারা মরেছে, তাদের দেহ এখানে ফেলে যাওয়া হয়। সবসময়ে তেল মেখে নিজেদের কতই বা টিঁকিয়ে রাখবে—কালো শয়তান গুলো মাটির ফুটো থেকে, গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হাওয়া এদিকে থাকলে জাল ভাসিয়ে উড়ে আসছে। একটু একটু করে শিম্পাঞ্জীদের সংখ্যা কমছে।"

"খুবই বিপদের কথা, গোনজালা," গালে হাত দিয়ে বললেন প্রফেসর।

"খুবই প্রফেসর, খুবই। অ্যাটম বোমার বিকিরণ শুধু যে মাকড়শাদের উন্নতি ঘটিয়েছে, তা তো নয়—শিম্পাঞ্জীদের ডি-এন-এ'তেও পরিবর্তন এনেছে—আরও আনছে—এখন এদের বাচ্চাকাচ্চারা মানুষের আরও কাছে চলে এসেছে—ক্রমবিবর্তনের লম্বা ফাঁকটা ডিঙ্গে মেরে দিচ্ছে এক লাফে !',

"অ্যাঁ !"

মুচকি হেসে বললে গোনজালা—আমাকে দেখে বুঝছেন না ?"

"তুমি তো ...তুমি তো মানুষ।"

"চট করে কথা ঘুরিয়ে নিল গোনজালা—সে যাক, ডাইনোসররা পৃথিবীতে আসবার আগে থেকেই মাকড়শা ছিল—ডাইনোসররা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে—কিন্তু টিকে রয়েছে মাকড়শারা। এরা হল 'যখন-যেমন-তখন-তেমন' দের জাত। খাবারের অভাব কিভাবে মিটিয়ে চলেছে দেখুন। জল থেকে মাছ ধরছে। এরপর প্রচণ্ড ঝড়ে পুরো জাল ভর্তি মাকড়শা ছড়িয়ে যাবে আশপাশের দ্বীপে—সেখান থেকে মহাদেশে। তারপর ?"

চোয়াল ঝুলে পড়ে প্রফেসরের—"সত্যিই তো !"

"খাবারের অভাবে মেয়েরা ছেলেদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলছে—এই যা রক্ষে। কিন্তু কতদিন ...আর কতদিন এরা আটকে থাকবে যমজ দ্বীপে ?"

"তা....ইয়ে....আমাদের কি করার আছে ? আমতা আমতা করে বললেন প্রফেসর।

গোনজালা বললে—"চলুন, প্লাটিনামের ভাঁড়ারটা আগে দেখিয়ে আনি—তারপর বলব।"

আবার ধাবিত হলাম শূন্য পথে নরবানরদের কাঁধে চেপে। হু-হু করে পাহাড় বেয়ে নানা পথ দিয়ে, মাকড়শাদের জালপাতা ঘাঁটি ঘুরে, পৌঁছোলাম একটা চুড়োয়।

জ্বালামুখে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে দেখলাম, অনেক নিচে খুব আস্তে আস্তে কাদা ফুটছে। ঘন কাদা অনেক পরে পরে ফুলে উঠছে—একটা বুদবুদ তৈরি করে ফাটিয়ে দিয়েই আবার তলিয়ে যাচ্ছে।

বিড় বিড় করে গোনজালা বললে—"কে জানে এই কাদার কেমিক্যালের জোরেই মাকড়শাগুলো এত বেড়েছে কিনা।"

প্রফেসর নির্বাক। আমি হতবাক।

আবার শাখামৃগদের কাঁধে চেপে উড়ে এলাম গাছ থেকে গাছে—এক পাহাড় থেকে নেমে উঠে গেলাম আর এক পাহাড়ের জ্বালামুখের কিনারায়।

আর এইখানেই দেখলাম প্লাটিনাম মেট্যালদের বিশাল ভাণ্ডার !

অবিশ্বাস্য ! কিন্তু সত্যি ! চাঁই চাঁই সাদাটে ধাতু জ্বালামুখের ভেতরের গা বেয়ে নেমে গেছে অনেক নিচে পর্যন্ত। মাথার ওপর থেকে সূর্য একটু সরে যাওয়ার ফলে তলদেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—

কিন্তু সেখানেও যে চাঁই চাঁই সাদা ধাতু পড়ে রয়েছে—তাতে সন্দেহ নেই।

মরা আগুন পাহাড়ে এত দামি ধাতু ? যে ধাতু আলাদা ভাবে এমন রাশিকৃত অবস্থায় আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও পাওয়া যায় নি ?

আমরা এখন সমুদ্রের ধারে। হেলিকপ্টারের পাশে।

রিচার্ডের ডেডবডি কিন্তু উধাও।

অনুমান করতে পারলাম লাল এখন কোথায়।

মাকড়শাদের জঙ্গলের পাশে। শিম্পাঞ্জীরাই বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে। রাখুসে ক্ষিধে মিটিয়ে চলেছে যেভাবেই হোক। কেষ্টর জীবদেরই পেট ভরিয়ে চলেছে।

মনটা দমে গেল।

প্রফেসর আর গোনজালা এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটু দূরে গোল হয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছে শিম্পাঞ্জীরা।

প্রফেসর বললেন—"তোমাদের প্রত্যেকেই এখানে হাজির ?"

গোনজালা বললে—"আমাকে বাদ দিয়ে বলুন। হ্যাঁ, ওরা সব্বাই হাজির।"

"[illegible] তোমাকে বাদ দিলাম। সংখ্যায় ওরা ক'জন ?"

"একান্নজন।"

"তার মানে, এই দ্বীপে এক্কেবারে নতুন প্রজাতির অত্যন্ত উন্নত ধরনের একান্নটা শিম্পাঞ্জী রয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"এরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে ?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"প্লাটিনাম মেটালগুলো ঘুষ দিতে চাইছে ?"

"মনের কথা বলেছেন।"

"তারপর ?"

"গাছের তেল নিয়ে যাবে সঙ্গে। নমুনা হিসেবে। আপনারা ল্যাবোরেটরীতে হুবহু সেই রকম কীটনাশক বানিয়ে দেবেন। এরোপ্লেনে করে এনে গোটা দ্বীপে ছড়িয়ে দেবেন।"

"অর্চনারা তাতে মরে যাবে ?"

"সঙ্গে সঙ্গে।"

"প্রমাণ ?',

ইসারা করল গোনজালা। একটা শিম্পাঞ্জী একটা ডাব নিয়ে দৌড়ে এল। কাটা মুখটা গাছের লতা দিয়ে মুখেই বাঁধা রয়েছে।

লতা খুলে কাটা মুখটা ফেলে দিল গোনজালা। উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। নাকের মধ্যে দিয়ে ঝাঁঝালো গন্ধটা টাগরা পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল।

শার্টের মধ্যে থেকে সেই থলেটা বের করে গোনজালা। যার মধ্যে থেকে মাত্র তিনটে মাকড়শা বেরিয়ে এসে পরলোকে পাঠিয়েছে রিচার্ডকে।

খুব সন্তর্পনে থলির মুখ আলগা করে ডাবের কাটা মুখে টিপে ধরে গোনজালা।

পরক্ষণেই থলির মুখ টিপে ধরে ডাক দিলে আমাকে আর প্রফেসরকে—"অর্চনা মরছে !"

মরছেই বটে নিদারুণ যন্ত্রণায় একটা মাকড়শা আট পা নাড়তে নাড়তে মারা যাচ্ছে ডাব ভর্তি তেলের মধ্যে। তার কালো মখমলের মত দেহে লাল টকটকে ফুটকি গুলো যেন আরও লাল হয়ে উঠছে মৃত্যু যন্ত্রণায়।

বড় আনন্দ পেলাম অর্চনার মৃত্যু দেখে।

একান্নটা শিম্পাঞ্জীকে জাহাজে তুলে আমরা এখন ফিরে চলেছি স্বদেশে। একান্নজনই কাঁড়ি কাঁড়ি প্লাটিনাম চাঁই বয়ে এনে ভরে দিয়েছে জাহাজের খোল। আরও আছে আগুন পাহাড়ের গর্ভে।

গোনজালা মনের আনন্দে কলা খাচ্ছে।

এখনও বুঝলাম না, আসলে সে কী !

মানুষ, না, শিম্পাঞ্জী ?

হাতের দস্তানা খুলে আঙুলগুলো দেখতে হবে !
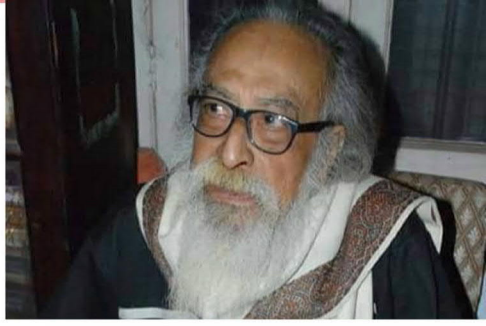
'কল্পবিজ্ঞান' শব্দবন্ধটার স্রষ্টাও তিনি। শুধু সাহিত্যের আকারে বাঙালিকে কল্পবিজ্ঞান পড়তে শেখানোই নয়, তিনি বাঙালি পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সোমবার গভীর রাতে প্রয়াত হলেন অদ্রীশ বর্ধন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বস্তুত বাংলাতেও যে বিজ্ঞানচর্চা হতে পারে কিংবা বিজ্ঞানে বাংলার অবদানের কথা বারবার তাঁর কলমে উঠে এসেছে। অদ্রীশ বর্ধনের লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, বহু কঠিনতম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেও তিনি সাহিত্যগুণের মাধ্যমে অত্যন্ত সরল, সহজ করে তুলতেন পাঠকদের কাছে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তো বটেই, অদ্রীশ বর্ধন জন্ম দিয়েছিলেন কত সব মায়াবী চরিত্রের। ফাদার ঘনশ্যাম, জিরো গজানন, চাণক্য চাকলা, নারায়ণী ও ইন্দ্রনাথ রুদ্রর মতো চরিত্র বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিল হটকেক।

কল্পবিজ্ঞান নিয়েই তাঁর কার্যকলাপ মূলত ঘোরাফেরা করলেও অদ্রীশ বর্ধন কিন্তু গোয়েন্দা চরিত্রও নির্মাণ করেছেন একের পর এক। ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়াও অনুবাদ করেছেন বহু বিদেশী সাহিত্যও।